সময় ও ইতিহাসের প্রেক্ষিতে লেখক তারাশঙ্কর

সরোজমোহন মিত্র

তারাশঙ্কর বাঙলা সাহিত্যের এবং পশ্চিমবঙ্গের এক অসাধারণ কৃতী পুষ। তিনি ১৯৪৭ সালে কলিকাতা ঝিবিদ্যালয়ের শরৎস্মৃতি পুরস্কার লাভ করেন। তার পূর্বেই তিনি ১৯৪৪ এবং ১৯৪৫ সালে কানপুরে এবং আসামে বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে সাহিত্য শাখার সভাপতি নির্বাচিত হয়ে যোগ দিয়েছিলেন। ১৯৫১ সালে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল কর্তৃক বিধান পরিষদের সদস্য মনোনীত হন। ১৯৫৫ সালে রবীন্দ্র পুরস্কারে ভূষিত হন। ১৯৫৬ সালে সাহিত্য আকাদেমী পুরস্কার লাভ করেন। সরকারী প্রতিনিধি হিসেবে চীনে গমন করেন। ১৯৫৭ সালে তাসখন্দে ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নেতা হিসেবে আফ্রো এশিয় লেখক সম্মেলনে যোগদান করেন। ১৯৫৯ সালে মাদ্রাজে নিখিল ভারত লেখক সম্মেলনের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। ১৯৬০ সালে কলিকাতা ঝিবিদ্যালয়ের বার্ষিক সমাবর্তন উৎসবে 'জগত্তারিণী' পদক লাভ করেন, এই বছরেই বিশিষ্ট সাহিত্যিক হিসাবে মাননীয় রাষ্ট্রপতি তাঁকে রাজ্যসভার সদস্য মনোনীত করেন, ১৯৬২ সালে তিনি প্রথমে পদ্মশ্রী এবং পরে পদ্মভূষণ উপাধিতে ভূষিত হন, ১৯৬৭ সালে নাগপুরে নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। এবছর তাঁর জীবনের একটি সফলতম বছর। এ বছরে তিনি জ্ঞানপীঠ পুরস্কার লাভ করেন, কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠান থেকে তাঁকে নাগরিক সম্বর্ধনা জানানো হয়। যাদবপুর, কলিকাতা ও রবীন্দ্র ভারতী ঝিবিদ্যালয় থেকে তঁাকে সম্মানসূচক ডি. লিট. উপাধিতে সম্মানিত করা হয়। মৃত্যুর পূর্বে তিনি ১৯৭০ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হন। তারাশঙ্করের পূর্বে এবং পরে এত সম্মানে আর কেউ সম্মানিত হতে পারেন নি।

এবছর সেই কীর্তিমান মহাপুষ জন্মশতবৎসর। তাঁর জন্ম হয়েছিল বীরভূম জেলার লাভপুর গ্রামে ২৩ জুলাই, ১৮৯৮ আর তাঁর মৃত্যু হয়েছিল ২৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১। এই দীর্ঘ জীবন ধরে তিনি ৬৮ উপন্যাস, ৩৭ গল্পগ্রন্থ, ৪ আত্মজীবনী ও প্রবন্ধ সংকলন, এবং একটি করে কাব্যগ্রন্থ, ভ্রমণ এবং নাটক রচনা করেছেন। এই বিপুল সৃষ্টিও বাংলা সাহিত্যের এক ঈর্ষণীয় গৌরব। তবু এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়, সাহিত্য জগতে তারাশঙ্করের আবির্ভাব অপেক্ষাকৃত বেশী বয়সে। তাঁর যখন ২৮ বছর বয়স তখন তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ত্রিপত্র' প্রকাশিত হয় এবং তাঁর ৩৩ বছর বয়সে তাঁর প্রথম উপন্যাস 'চৈতালী ঘূর্ণি' প্রকাশিত হয়। যদি অন্যদের ন্যায় তাঁর আরও কম বয়সে সাহিত্য জীবন শু হোত তাহলে আমরা তাঁর কাছে থেকে হয়তো আরও বেশী সৃষ্টি লাভ করতাম।

সাহিত্যে তারাশঙ্করের প্রবেশ শরৎচন্দ্রের পথ ধরে। তিনি তাঁর 'আমার সাহিত্য জীবন' গ্রন্থে স্বীকার করেছেন, ''শরৎচন্দ্রকে অক্ষম ভাবে অনুকরণ করেছিলাম''। শরৎচন্দ্র এবং তারাশঙ্করের লিখন রীতির বৈশিষ্ট্য আলোচনা করলেই শরৎচন্দ্রের প্রতি তারাশঙ্করের প্রবণতা স্পষ্ট হবে। আমাদের আলোচনা স্বতন্ত্র। তবে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তারাশঙ্করের অনেক মিল আছে। শরৎচন্দ্র যেমন তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যে গল্প-রসের প্রাধান্য দিতেন, তারাশঙ্করও এই গল্পের উপরই জোর দিয়েছেন। ''মানুষ সর্বাগ্রে চায় গল্প।'' দ্বিতীয়ত শরৎচন্দ্র যেমন বলতেন আমার গল্পে নববই ভাগ সত্য বাকী দশ ভাগ নিয়েছি কল্পনা করে। তারাশঙ্করও অনেক ক্ষেত্রেই বলতে পারতেন, তাঁর গল্প উপন্যাসের ঘটনার 'পনেরো আনা সত্য'। তৃতীয়ত, শরৎচন্দ্রের মতই তারাশঙ্কর বাঙলা সাহিত্যে এসেছিলেন পুঁথিগত বিদ্যা-বুদ্ধির জোরে নয়, তাঁদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার জোরে। গ্রাম বাঙলার মানুষের সম্পর্কে এমন নিবিড় এবং ব্যাপক অভিজ্ঞতা শরৎচন্দ্র এবং তারাশঙ্করের মত কার ছিল না বললে বোধহয় অত্যুক্তি হবে না। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় পথের পাঁচালি, আরণ্যক এবং অজস্র গল্প লিখেছিলেন তাঁর অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় 'পুতুল নাচের ইতিকথা' এবং 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে তার অভিজ্ঞতাকে অমর করে তুলেছেন কিন্তু শরৎচ ন্দ্র এবং তারাশঙ্কর যেমন আজীবন গ্রামীন জনজীবনের সঙ্গে আষ্টি ছিলেন তেমন বোধহয় আর কেউ ছিলেন না। সেজন্য সজনীকান্ত দাস যখন তারাশঙ্কর সম্পর্কে বলেন, ''এই লোকটি বাঙলা সাহিত্যে অনেক কথা — এ যুগের লেখকদের সকলের চেয়ে বেশী কথা — বলতে এসেছে। এর পুঁজি অনেক। এনেছে অনেক।'' তখন মনে হয় সবচেয়ে খাঁটি কথা।

তারাশঙ্করের জীবনের দিকে তাকালে আমরা এর সত্যতা উপলব্ধি করতে পারব। এক ছোটো জমিদার বংশে তার জন্ম। সেই জমিদারিরও তখন ক্ষয়িষ্ণু অবস্থা। অন্যদিকে তখন আবির্ভাব ঘটছে ধনতন্ত্রের। জমিদাররাই তখনো গ্রাম্য সমাজে উচ্চতর আসনে। এরা ব্রাহ্মণ, রথীপদবাচ্য। ''কিছু জমিদার, কিছু জমি, পুকুর, বাগানের মালিক সকলেই, সকলেই মহামানী দুর্যোধনের মতো মানী। সকলেরই পণ — বিনা রণে নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী।'' এদের বড় পুঁজি প্রাচীন কালের শিক্ষা ও আভিজাত্য। অন্যদিকে ছিল এমন পরিবার সমগ্র ভারতে সম্প্রসারিত কয়লার ব্যবসায় যাদের প্রচুর অর্থ। এছাড়াও ছিল উকিল চাকুরে। সকলেই প্রতিষ্ঠার জন্য যুধ্যমান। এই প্রতিষ্ঠার দ্বন্দ্ব জর্জর লাভপুরকে তারাশঙ্কর নির্মম অভিজ্ঞতায় ভালোভাবেই জানতেন।

এই গ্রাম সম্পর্কে তিনি-পরেও লিখেছেন, ''আমাদের গ্রামটি বর্ধিষ্ণুগ্রাম — ধনসম্পদের, ভূসম্পত্তির অহংকারে অহংকৃত ছিল আমাদের গ্রাম। হাল ফ্যাসানের চতুরঙ্গবাহিনীর অভিযান দিকে দিকে। আগেকার কালের ব্রাহ্মণ্য দৃপ্ততা, নবাবি আমলের সামন্ততান্ত্রিক বনেদিয়ানার কালের সীমানা, কুইকমার্চের পদক্ষেপে অতিক্রম করে ইংরেজি আমলের অ্যারিস্টোক্রেসির গাম্ভীর্যে থমথম করছে, আবার কয়লাকুঠির মালিকানির ও কয়লা-ব্যবসার মধ্যস্বত্বাধিকারীর অর্থাৎ -এর স াফল্যে কর্মগৌরবে গৌরবান্বিত; অর্থাৎ আভিজাত্য গৌরব বংশগত এবং ব্যক্তিগত জীবনসাধনার সিদ্ধি লক্ষ্মীর কৃপাসাপেক্ষ; এবং লক্ষ্মীর ঘরের চাবি কয়লার ব্যবসাজগতে বিশেষ স্থান হেতু তাঁদের করতলগত।'' (পৃ ২৪৪) ''মাত্র আট বৎসর বয়সে তাঁর পিতৃবিয়োগ ঘটে। তারপর থেকে তাঁকে সাংসারিক দায় দায়িত্বের সঙ্গে, চাষ বাস, প্রজার সঙ্গে লেনদেন প্রভৃতির সঙ্গে যুক্ত হতে হয়।

তার মধ্যেও গ্রামীণ সংস্কৃতির পরিবেশের সঙ্গে তাল মিলিয়ে তারাশঙ্করের মধ্যে কবি-চেতনা, নাটক-থিয়েটারেরও প্রবণতা গড়ে ওঠে। তারাশঙ্করের বয়স যখন মাত্র সাত বৎসর তখন বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলন দেখা দেয়। এই আন্দোলনের ঢেউ তারাশঙ্করের গ্রামেও এসে লেগেছিল। তিনি লিখেছেন, ''সেদিন মিছিল চলল করতাল বাজিয়ে, দেশের বন্দনা গান গেয়ে। বন্দেমাতরম ধ্বনি তুলে গ্রাম প্রদক্ষিণ করে এসে সবাই উপনীত হল আমাদের গ্রামের মহাপীঠে। সেখানে স্নান করলেন সকলে, 'বাংলার মাটি বাংলার জল' মন্ত্রোচ্চারণ করে হলুদ রঙের রাখী বাঁধলেন পরস্পরের হাতে। শপথ নিলেন। সকল দুর্বলতাকে করব পরিহার, অন্তরকে করব শুভ্র,

করব নির্মল, সুপরিচ্ছন্ন, সুপবিত্র।" (আমার কালের কথা)। তারাশঙ্করের হাতে রাখী বেঁধে দিয়েছিলেন তাঁর মা। শৈশবেই দীক্ষিত হলেন দেশাত্মবোধের মন্ত্রে। ১৯১১ সালে অর্থাৎ তারাশঙ্করের বয়স যখন তের বছর তখন বঙ্গ ভঙ্গ রোধে তার সমাপ্তি ঘটে, তারপরে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং তারও পরে অসহযোগ আন্দোলনেই প্রথম তারাশঙ্করের সক্রিয়তা দেখা যায়। তিনি লিখেছেন '১৯২১ সালে মহাত্মাজির অহিংস অসহযোগের আদর্শগত রোমান্টিসিজম আমার কল্পনাপ্রবণ মনকে আকর্ষণ করেছিল প্রবলভাবে।" (আমার সাহিত্য জীবন, পৃ ২৬)। অবশ্য মানবজীবনের মৌলিক নীতিবাদের সঙ্গে অহিংস আন্দোলনের একাত্মতা তাঁকে আকর্ষণ করেছিল। অবশ্য মানবজীবনের মৌলিক নীতিবাদ কি সেটা তিনি বিস্তারিত করেন নি। তারও আগে তারাশঙ্করের কৈশোর-যৌবনের সন্ধিক্ষণে রামপুরহাট অঞ্চলের বিপ্লবী বীর নলিনী তাঁর জীবনক্ষেত্রে দেশপ্রেমের বহ্নিকণা জাগিয়েছিলেন। সে বহ্নি পরম পবিত্র হলেও তিনি ঐ দলের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসার সুযোগ পাননি। দলীয় মনোভাব বা সশস্ত্র বিপ্লবের নেশাও তাঁর জীবনে বড়ো ছিল না। ১৯১৫-১৬ সালে দিকে দিকে ব্যর্থ হয়ে গেল বিপ্লবের উদ্যম। তবু তারাশঙ্করকেও কিছুদিন ধরে পুলিশের সতর্ক দৃষ্টির সামনে কাটাতে হল। তখন তার বোনের বিবাহ উপলক্ষে নিজেরও বিবাহ হয়ে গেল। তারাশঙ্করের শ্বশুরকুল ছিলেন কয়লা ব্যবসায়ের সঙ্গে জড়িত। তারাশঙ্করকে তাতে জড়িত করার চেষ্টা হয়েছিল কিন্তু তারাশঙ্কর সেদিকে বেশি আকর্ষণ বোধ করেন নি।

তারপরে এল উনিশশো একুশ। ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রের মতো তাঁর জীবনক্ষেত্রেও যুগান্তর ঘটল। তার আগে তিনি সাহিত্যসাধনা নিয়ে খুব চেষ্টা করছিলেন। তাতে একের পর এক ব্যর্থতায় এক সময় ঠিক করলেন, সাহিত্য সাধনার বাসনায় জলাঞ্জলি দিয়ে শান্ত গৃহস্থের মতো ধানচালের হিসেব করেই জীবনটা কাটিয়ে দেবেন এবং কংগ্রেসের কাজের মধ্যদিয়ে জেল খেটে কাটিয়ে দেবেন। ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট হিসেবে নানা গঠনমূলক কাজে। "সকালে বাইসিকেলে নিয়ে বের হই — গ্রামে গ্রামে ঘুরি, পথ-ঘাট-নালা-খাল দেখে বেড়াই। ভাঙা পথ মেরামত করাই, আঁকা বাঁকা নালাকে সোজা করে কাটাই, ওখানকার আবালবৃদ্ধবনিতার সঙ্গে পরিচয় করি। তাদের মনের খবর বিচিত্র পরিচয় নিজের মনে বহন করে ফিরে আসি।" ১৯২৪/২৫ সালে তাঁদের অঞ্চলে যে ব্যাপক মহামারির আক্রমণ হয়েছিল তাতে সেবার কাজে একাদিক্রমে ছ-মাস ৩০/৪০ গ্রাম ঘুরে বেড়িয়েছেন। গ্রাম্য ভদ্রজনের সমাজে, চাষির গ্রামে, বৈষ্ণবের আখড়ায় দেশের মানুষকে তিনি নিবিড়ভাবে জেনেছেন। সেই জানা কেবল বৈষয়িক ব্যবহারের মধ্য দিয়ে নয়। দেনা-পাওনা বা মামলা মোকদ্দমার মধ্য দিয়ে নয়, মানুষ হিসেবে মানুষের পরিচয় হিসেবেও তিনি তাদের জেনেছেন। আত্মার আত্মীয় হিসেবেই জেনেছেন।

গ্রামের অবস্থা বিচিত্ররূপে তিনি দেখেছেন। জেনেছেন প্রজার উপর জমিদারের নিপীড়ন, প্রজার কাছে খাজনা আদায়, সুদ, নেওয়া, খাজনা বৃদ্ধি করা, কাছারিতে মহাজন বসিয়ে রেখে তার কাছ থেকে প্রজাকে ঋণ নিতে বাধ্য করা, সুদ দিতে ব্যর্থ হলে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা। সেখানে তাঁর হয়েছে নির্মম অভিজ্ঞতা — "দেখেছি এক ভাই নিঃসঙ্গ অবস্থায় মারা গেল, অবীরা বিধবাটির হিতার্থী সেজে তার হাতে একশো টাকা দিয়ে হাজার টাকার মূল্যের সম্পত্তি লিখে নিলেন। কথা থাকল সম্পত্তি দখল পেলে তাকে আরও টাকা দেবেন, কিছু জমিও দেবেন। .... দখল হল। বিধবা এল। রিক্তহস্তে ফিরে গেল।" এর সঙ্গে ছিল শরৎচন্দ্রের উপন্যাস পড়ার অভিজ্ঞতা, "রমা, অন্নদাদিদি, রাজলক্ষ্মী, সাবিত্রীর জীবনের ব্যর্থতায় বেদনাহত হয়েছি, এবং দেখেছি সমাজ সর্বত্র আছে ত্রিভুজের এক কোণে, বিপুল তার শক্তি, কঠিন তার আক্রোশ। আমার বিচিত্র অভিজ্ঞতায় আমি দেখলাম তার শক্তি নাই, সে মুমূর্ষু — শক্তি তার নাই, সে সক্রিয় নয়, শুধু আয়তন এবং ভারটা একদা বিপুল ছিল বলেই ঘটোৎকচের দেহের মতো সে জীবনের গতির পথ রোধ করে পড়ে আছে। ওর দেহে চাবুকের আঘাতে স্পন্দন জাগবে না, ওকে ভারী ধারালো অস্ত্রাঘাতে খন্ডখন্ড করে সরিয়ে সৎকার করতে হবে। চিতা জ্বালাতে হবে। শবদেহটা আগলে আছে বৈদেশিক রাজশক্তি। একটাকে সরিয়ে আর একটাকে রাখলে চলবে না। দুটোকেএকসঙ্গে সরাতে হবে। এক চিতায় দুটো যাবে।" আমরা দেখলাম তারাশঙ্করের অভিজ্ঞতা ছিল, শিক্ষাও ছিল, ভবিশষ্যতের সংকল্পও ছিল। ১৯২০ থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত তারশঙ্কর প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯১৭ সালে তিনি অন্তরীণ হন আর ১৯৩০ সালে জেলে যান। তার আগেই শৈশবেই ১৯১১/১২ সালেই বিবেকানন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র আর কিশোর ক্ষুদিরামের আদর্শে তিনি উদ্বুদ্ধ। সমসাময়িক রাজনৈতিক পরিস্থিতির দ্বারা প্রভাবিত হলেও ১৯৩১ সালের প্রথমেই জেল থেকে মুক্তি পেয়ে তিনি রাজনৈতিক আন্দোলনের পথ থেকে মুক্তি নিলেন, রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা তাঁর তিক্ত। "যৌবনের কিছু আগেই জীবনের সব কামনা একত্রীভূত হয়ে পরাধীনতার অবসান করে দেশকে স্বাধীন করবার যে জীবনযজ্ঞ তাতেই আহুতি দিয়াছিলাম, সে যজ্ঞের আগুন নিয়ে নিজের ওই হোমবহ্নিকেই প্রজ্জ্বলিত রেখেছিল আমার মধ্যে। ১৯১৭ সনে অন্তরীণ হওয়া থেকে ১৯৩০ সনে জেলে যাওয়া অবধি বিভিন্ন সময়ে ও ক্ষেত্রে দেশের স্বাধীনতাকামী আত্মত্যাগী সৈনিকের মধ্যে দলগত বিরোধে যে মর্মান্তিক সংঘাত দেখেছিলাম, তাতে বেদনা হয়েছিল যেমন মর্মান্তিক রাজনৈতিক দলবাদের প্রতি বিতৃষ্ণাও হয়েছিল তেমনি বা ততোধিক।" (আমার কালের কথা)। স্থির করেছিলাম "আমি সাহিত্যের পথে এই যুদ্ধ আর মাতৃভূমির সেবা করে যাব।"

১৯৩১ থেকে সাহিত্যের পথে পা দিয়ে 'চৈতালী ঘূর্ণি', 'ধাত্রীদেবতা', 'কালিন্দী', 'গণদেবতা', 'পঞ্চগ্রাম' প্রভৃতি উপন্যাসের মধ্যে তাঁর এই মনোভাবকেই প্রকাশ করেছেন। 'চৈতালী ঘূর্ণি' উপন্যাসে তারাশঙ্কর গ্রামীণ জীবনের মর্মন্তুদ চিত্র এঁকেছেন ঃ সেখানে জমিদারের অত্যাচার, শোষণের কথা আছে। কৃষক ও শ্রমিকের প্রতি সহানুভূতির কথা আছে, বিপ্লবের কথাও আছে। জমিদারের অত্যাচার গোষ্ঠ গ্রাম ত্যাগ করেছে। যাবার আগে সে বলেছে "কিসের তরে থাকব, জমি গেল, ছেলে গেল, পেট দুটো যেখানে খাটাবো সেখানেই ভাত, এখানেও খাটা, বাইরেও খাটা। ঘর! গাছতলা তো আছে।" সে বলে, "ভগবান নেই, নইলে একজন অট্টালিকায় ঘুমায় আর দশজন রোদে পোড়ে, ঝড়ে বাদলে মরে?" এই উপন্যাসে শ্রমিকের কথা আছে, ট্রেড ইউনিয়নের কথা আছে, বিপ্লবের নেতৃত্ব নিম্ন মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণীর হাতে। উপন্যাসের শেষ হল ব্যর্থ বিপ্লবে। কলের শ্রমিক ধর্মঘট। পুলিশের গুলিতে গোষ্ঠ নিহত। এই বইখানি তিনি উৎসর্গ করেছিলেন বাঙলার যৌবনশক্তির প্রতীক, নবযুগের অগ্রদূত সুভাষচন্দ্রের নামে।

ধাত্রীদেবতা তারাশঙ্করের আত্মজৈবনিক উপন্যাস। এই উপন্যাসের নায়ক শিবনাথ জমিদারপুত্র হয়েও ময়ের প্রভাবে ছেলেবেলা থেকেই বিদেশী দ্রব্য বর্জন করে এবং সেবা ধর্ম পালনের মধ্যদিয়ে দেশপ্রীতির পরিচয় দেয়। জনগণের সঙ্গে তার নিবিড় পরিচয়, মমতার সম্পর্ক। দেশকে সে ভালবাসে দেশের কাজে আত্মোৎসর্গ করতে চায়। কিন্তু সন্ত্রাসবাদের পথকে সে সমর্থন করে না। তাকে তার মনে হয় 'নীরন্ধ্র অন্ধকার পথ' এবং 'স্বাধীনতার লক্ষ্যের সংক্ষিপ্ত পথ।' শিবনাথ অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারাবরণ করে। জনগণের সঙ্গে মিশে শিবনাথের ধারণা হয়েছে 'স্বাধীনতা তাহাদের কাছে একটা দুর্বোধ্য শব্দ।' সেজন্য স্বাধীনতা আন্দোলনে তারা সাহায্য করবার উপযুক্ত প্রেরণা লাভ করেনি। বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে শিবনাথের যোগ ছিল। সেও বিশ্বাস করত "ইংরেজ তাড়ানোর নামই স্বাধীনতা নয়। ..... দেশের সত্যকার স্বাধীনতা তা থেকে পৃথক।" স্বাধীনতা বলতে সেও বিশ্বাস করত "এস্টাবলিশমেন্ট অব এ গবর্ণমেন্ট অব দি পিপ্‌ল, বাই দি পিপল, নট ফর দি সেক অব দি পিপ্‌ল। অনুগ্রহ নয়, তেত্রিশ কোটির দাবির বস্তু গ্রহণ করতে ছেষট্টি কোটি হাত এগিয়ে আসা চাই।" শিবনাথ বিশ্বাস করত কেবলমাত্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অপসারণেই স্বাধীনতা নয়, তার জন্য প্রয়োজন অর্থনৈতিক পুনর্জ্জীবন। তাই সে গ্রামে চরকা কাটা ও তাঁতের প্রচলনে আগ্রহী হয়েছে। চাষীদের সংঘবদ্ধ অহিংস গণ আন্দোলন সে প্রত্যাশা করেছে।

১৯৪২ সালের আগষ্ট বিপ্লব এবং সাইক্লোনের পটভূমিকায় তারাশঙ্কর লিখেছেন তাঁর সবচেয়ে জনপ্রিয় উপন্যাস 'গণদেবতা'। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ফ্যাসিবাদের বিশ্বগ্রাসী তান্ডবের মধ্যে যে বিশ্বব্যাপী গণ-চেতনা গড়ে উঠেছিল তাকেই বোধ হয় লক্ষ্য করে তিনি উপন্যাসের নাম দিয়েছিলেন 'গণদেবতা'। কারণ উপন্যাসের মধ্যে এই নামের সার্থকতা খুঁজে পাওয়া শক্ত। এককালের ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট, জেলখাটা রাজনীতিবিদ রাজনীতি ছেড়ে সাহিত্য করতে এসেও তাঁর রাজনীতিবোধ বিস্মৃত হন নি। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, "হাজার হাজার বৎসর ধরে মানুষের প্রতি মানুষের অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্তের কাল একদিন আসবেই। এই আমি বুঝেছিল

াম। উনিশশো ষোল সতের সাল থেকে উনিশ শো ত্রিশ একত্রিশ সাল পর্যন্ত গ্রামে গ্রামে মানুষদের মধ্যে ঘুরে এইটুকু বুঝেছিলাম যে, সেদিন আর দেরী হবে না। শবিপ্লব সেই দিনের উষাকাল তাতে সন্দেহ নাই। বাতাসটা উঠেছিল সেইখানেই প্রথম, সেখান থেকেই বাতাস উঠে এখানকার গুমটের মধ্যে চাঞ্চল্য তুলেছে।'' (আমার সাহিত্য জীবন, পৃ ৬৯) অবশ্য এই উপলব্ধি মার্কসের ক্যাপিট্যাল বা তাঁর লেখা কোন বই পড়ে নয়, তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাজাত উপলব্ধি। মার্কসবাদের বস্তুবাদ সর্বস্বতাকেই তিনি মানতে পারেন নি।

সেজন্য তারাশঙ্কর গ্রামের এক সঠিক চিত্র নিয়ে উপন্যাসটা আরম্ভ করলেও তাঁকে ঈপ্সিত লক্ষ্যের দিকে নিয়ে যেতে পারেন নি। তাঁর 'পাষাণপুরী' উপন্যাসের নায়ক চোখে দেখা কালী কর্মকারের আদলে এই উপন্যাসে অনিন্দ্য কর্মকারকে সৃষ্টি করতে গিয়েও শে, পর্যন্ত সংগ্রামী চেতনা বড় হয়ে ওঠে নি। 'চৈতালী ঘূর্ণি' উপন্যাস লেখার সময়েই তাঁর স্নেহের মেয়ে বুলু মারা যাওয়ার পর তিনি প্রায় শ্মশানে গিয়ে বসে থাকতেন। সেই আদলেই এই উপন্যাসে দেবু চরিত্রকে প্রধান করে তুলেছেন। একদিকে শোষণ, শাসন, অত্যাচার অন্যদিকে প্রতিবাদের সোচ্চার ঘোষণা, দেশগঠনের আদর্শ - এই সাংঘাতকে কেন্দ্র করে 'গণদেবতা' গণমানুষের বিক্ষোভ বিদ্রোহের অগ্নিগর্ভ উপন্যাস হয়ে ওঠেনি। উপন্যাসের শেষে দেবু শুনতে পেল মহাগ্রামের ন্যায়রত্নের বাড়িতে রথযাত্রার ঢাকের শব্দ। ঠাকুর রথে চড়েছে। রথ হয়তো চলতে শু করেছে। এই কটি লাইনের মধ্যেই তারাশঙ্কর ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের আহ্বান ধ্বনি শুনতে পেয়েছিলেন। কঠোর বাস্তবতা ভাবালুতার ফানুসে বিলীন হয়ে গেল।

তারাশঙ্করের গোটা জীবিতকালটা আমাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের বহু গুত্বপূর্ণ ঘটনা ও সঙ্কটের কাল। তারাশঙ্করের বৈশিষ্ট্য হল তিনি সব সময়েই এই সব ঘটনার সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ জড়িত ছিলেন। বিশ এবং তিরিশ দশকের তিনি যেমন অসহযোগ এবং গান্ধীবাদী রাজনীতির আদর্শের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, তেমনি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় এদেশে যখন ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ গড়ে উঠেছিল তখন তার সঙ্গেও যুক্ত হয়েছিলেন। ১৯৪২ সালের শেষে ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের প্রথম সম্মেলনে। তিনি সভাপতি হিসেবে উদ্দীপক ভাষণ দিয়েছিলেন। ১৯৪৪ সালের দ্বিতীয় সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হিসেবে তিনি বলেছিলেন, ''আমরা ভুলি নাই যে যখন গত কয়েকমাস ধরিয়া লক্ষ লক্ষ লোক অন্নহীন ও বস্ত্রহীন অবস্থায় পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে তখন অনেকগুলি দেশী মিল কাপড় ও চাউলের ব্যবসায়ে লক্ষ লক্ষ টাকা সুপার ইনকামট্যাক্স দিয়াছে। এই সমস্ত মুনাফাখোরদের বিদ্ধে আমাদের সহিত্যিক কর্তব্য পালন করিব আর এই সংকটের মধ্যে আমাদের দুঃস্থ দেশকর্মীকে সান্ত্বনা, আশা ও নূতন জীবনের ভরসা শুনাইব। অনাগত মুক্তির বাণী বহন করিবার ভার লইয়াছে এই লেখক ও শিল্পী সংঘ।'' ১৯৪৫ সালের মার্চ মাসে এই সঙেঘর তৃতীয় সম্মেলনেও তিনি ছিলেন সভাপতি মন্ডলীর অন্যতম সদস্য।

১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষের ক্ষমতা হস্তান্তরের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা পাওয়ার পরেও প্রগতি লেখক আন্দোলনের সঙ্গে তারাশঙ্করের সম্পর্ক অব্যাহত ছিল। এই সময়ের মধ্যেই তিনি লিখেছেন 'গণদেবতা' এবং 'মন্বন্তর'। 'গণদেবতা' উপন্যাসে বিশ্বনাথ ছিল সাম্যবাদে বিশ্বাসী। 'মন্বন্তর' উপন্যাসে নায়ক কানাই সাম্যবাদী, নায়িকা নীলা ও তার ভাই নেপী সাম্যবাদী। মন্বন্তরের পরিপ্রেক্ষিতে কমিউনিষ্টদের সেবাকর্মকে তিনি এই উপন্যাসে তুলে ধরেছেন । উপন্যাস ছাড়াও এই সময়কার গল্পেও 'চৈতালী ঘূর্ণি' উপন্যাসে তিনি যে সমাজ চেতনার কথা বলেছিলেন তা নতুন মাত্রা লাভ করেছে। যদিও সেখানেও বাস্তববাদের চেয়ে ভাবাদর্শই প্রধান হয়ে উঠেছে। গান্ধীবাদের আদর্শের ফলেই হয়ত তাঁর মধ্যে অবতারবাদ, ব্যক্তিত্ববাদ এবং ভাববাদ দৃঢ় মূল লাভ করেছিল।

১৯৪৭ সালেই তারাশঙ্করের সঙ্গে বামপন্থী আন্দোলন তথা প্রগতি লেখক সংঘের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভ এবং তার ফলে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক, প্রশাসনিক এবং সামাজিক অবস্থানেরও অনিবার্য ভাবে বহু পরিবর্তন ঘটেছিল। একদিকে নতুন পরিস্থিতি, নতুন সুযোগ, সম্মান ও প্রতিষ্ঠার নতুন নতুন সম্ভাবনা বামপন্থী বহু মানুষকেও আকৃষ্ট করেছিল। একই সঙ্গে স্বাধীনতার পরে পরেই কমিউনিষ্ট পার্টির উগ্র বামপন্থা, কমিউনিষ্ট পার্টির উপর স্বাধীন ভারতের নতুন কংগ্রেসী সরকারের প্রচন্ড দমন পীড়ন, নিষেধাজ্ঞা, আক্রমণ প্রভৃতি বামপন্থীদের সন্ত্রস্ত, বিভ্রান্ত করেছিল। যাইহোক, পরবর্তীকালে ১৯৬৬ সালে প্রকাশিত 'আমার সাহিত্য জীবন' গ্রন্থে তারাশঙ্কর বামপন্থীদের সঙ্গে তাঁর তিক্ততার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন যা স্বাভাবিকভাবেই ছিল এক পক্ষীয়। অন্যপক্ষে তার বিরূপ আলোচনাও হয়েছিল। সে সবই এখন ইতিহাস।

১৯৪২ সালে ফ্যাসিষ্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের সভাপতি হিসেবে তারাশঙ্কর বলেছিলেন, ''আমার যৌবনে আমি সোভিয়েট রাশিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হই — তবে তখন আমার চেতনা রোমান্টিক ছিল। কিন্তু ১৯৩০ সালের পর থেকে নবতর চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে — আমি সোভিয়েট ইউনিয়নকে মানবতার দুর্গ ও দুনিয়ার আশা ভরসাস্থল হিসাবে গণ্য করি।'' ১৯৪২ সালের আগষ্ট আন্দোলন সম্পর্কে ঐ ভাষণেই বলেছিলেন, ''ভারতের জনসাধারণ, তার শ্রেষ্ঠ জাতীয় প্রতিষ্ঠান, তার সংবাদপত্র, তার সাহিত্যিক, তার মনীষীবর্গ কেউই চায় না ফ্যাসিবাদী জার্মানিকে, জাপানকে অথবা ইটালিকে। কিন্তু তবু আমাদের সম্মুখে এক অদ্ভুত সমস্যা। ব্রিটিশ আমলাতন্ত্রের দমননীতি, ভেদনীতি, কূটনীতি, ভারতে ফ্যাসিবাদের বিদ্ধে উদ্বেলিত জনশক্তির উদ্যত হাত পঙ্গু করে দিয়েছে। ভারতের শ্রেষ্ঠজাতীয় প্রতিষ্ঠান আজ বিপর্যস্ত, নেতারা বন্দী। উন্মত্ত জনসাধারণ সমগ্র দেশে তান্ডব শু করে দিয়েছে — তার ফলে জনশক্তির ব্যর্থ অপচয় হয়ে চলেছে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে। ..... ভারতের জনসাধারণ একটা শিকল খসাবার জন্য আর একটা শিকল পরতে চায় না এবং চাইবে না। .....একদল সুবিধান্বেষী কৌশলতান্ত্রিক আছে, তারা বলে — ষাঁড়ের শত্রু বাঘে মারছে। প্রদীপের নিচেই অন্ধকারের মতো এই অতি বুদ্ধিমানদের বিষয়বুদ্ধির মধ্যে বাঘে যদি মেরেই ফেলে ষাঁড় নাচে কি অশ্বস্ত হয় কোন আনন্দে কোন আশ্বাসে? কারণ বাঘের চেয়ে বড় শত্রু ষাঁড়ের আর কে আছে? এই ফ্যাসিবাদের স্বরূপ তারা বোধ করি কল্পনা করতে পারে না।''

তারাশঙ্করের প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ ছাড়াও Friends of the Soviet Union এর উপর্যুপরি তিন বছর সভাপতিত্ব ও People's Relief Committee -র দীর্ঘকালের সদস্য ছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে 'আমার সাহিত্য জীবনে' লেখেন যে, প্রগতিশীল সংস্থাগুলির পশ্চাতে কমিউনিষ্ট প্রভাব আছে একথা না জেনেই তিনি এই দলগুলিতে যোগ দিতে গিয়েছিলেন! অবশ্য তিনি অত্যন্ত পরিণত বয়সেই প্রগতিশীল আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। ১৯৪৮ সাল থেকেই তারাশঙ্কর সোভিয়েট রাশিয়া, সাম্যবাদ, প্রগতি সাহিত্য এবং ভারতীয় সাম্যবাদীদের উপর বীতরাগ হন। তারপর থেকে তিনি বশিষ্ঠ, পুন্যফল, আত্মা, আত্মদহন প্রভৃতির প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসের কথা প্রকাশ করতে থাকেন। এই সময়ে চীন এবং রাশিয়া ভ্রমণ করলেও তাঁর মনোভাবের আর কোন পরিবর্তন হয়নি। ১৯৫২ সাল থেকেই নানা পুরস্কারে এবং নানা সম্মানে ভূষিত হন। প্রবন্ধের প্রথমেই তার কিছু পরিচয় দেওয়া হয়েছে। পঞ্চাশের দশকে তিনি কমিউনিষ্ট পার্টির সঙ্গে সংস্রব ছিন্ন করে কংগ্রেসের সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন। ''শুধু তাই নয়, নিজের জন্য, নিকটতম আত্মীয় স্বজনদের জন্য কংগ্রেস সরকারের হাত থেকে নানাবিধ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে চলেছিলেন। নারায়ণ চৌধুরী ১৯৯০ সালে 'পল্লীগ্রাম' পত্রিকায় লিখেছিলেন, ''তারাশঙ্কর কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর ভাগ্য গ্রথিত করার ফলে কংগ্রেস সরকারের হাত থেকে প্রচুর সুযোগ-সুবিধা আহরণ করে নিতে পেরেছিলেন। তিনি নিজে এম. এল. এ. পি. হয়েছিলেন, ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের হস্তক্ষেপে ও বদান্যতায় রবীন্দ্র পুরস্কার পেয়েছিলেন, চীন ও সোভিয়েত সরকারি সাংস্কৃতিক ডেলিগেশনের নেতৃত্বের অধিকার লাভ করেছিলেন, কংগ্রেসের সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা পদে ভূষিত হয়েছিলেন, আরও কত কী। শুধু তাই নয়, ভ্রাতুষ্পুত্র, জামাতা এঁদের সরকারি চাকরিতে বসাবার ব্যবস্থা পাকা করেছিলেন।''

তারাশঙ্কর আবাল্য খুব কর্মঠ এবং পরিশ্রমী মানুষ ছিলেন। তিনি যখন খ্যাতির শীর্ষে অবস্থান করেছেন তখন তাঁর পরিচিতি ছিল কমিউনিষ্ট বিরোধী হিসেবে। সেই সময় মার্কিনদের সঙ্গে তাঁর ভাল যোগাযোগ ঘটেছিল। মার্কিন মদতে পুষ্ট 'এশিয়' নামক সাপ্তাহিক পত্রিকায় কমিউনিষ্টদের অশ্রদ্ধেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টায় একাধিক প্রবন্ধ-নিবন্ধ রচনায় ব্যাপৃত হয়েছিলেন, ওই সংস্থা থেকে প্রকাশিত কোয়েষ্টলারের বিতর্কিত পুস্তক -এর বাংলা তর্জমার ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন, দিল্লী

থেকে আগত সি. আই. এ-র চর গোয়েল নামক এক কুখ্যাত ব্যক্তির সঙ্গে দ্বদ্বার কক্ষে ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে বৈঠক করেছিলেন, কংগ্রেস নেতা অতুল্য ঘোষ সম্পাদিত জনসেবক পত্রিকার অন্যতম সম্পাদকীয় লেখকরূপে কমিউনিজম ও কমিউনিষ্টদের বিদ্ধে পরিকল্পিত জেহাদে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, ইত্যাদি।" এখানে উল্লেখযোগ্য, নারায়ণ চৌধুরী তারাশঙ্করের খুবই ঘনিষ্ঠ ছিলেন। তাছাড়া ডাঃ বিধান রায়ের পরিকল্পিত বঙ্গ-বিহার একত্রিকরণের বড় সমর্থক ছিলেন।

তারাশঙ্করের জন্ম শতবর্ষে এই সব উল্লেখ তাঁর প্রতি অশ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য নয়। শতবর্ষ পরে একজন মানুষের মূল্যায়নে স্বাভাবিকভাবেই প্রাসঙ্গিক ইতিহাস স্মরণে আসে। তার থেকে ব্যক্তি মানুষের প্রবণতাটা বুঝতে সাহায্য হয়। ব্যক্তি জীবনের প্রসঙ্গ সাহিত্যসৃষ্টির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। একথা অনস্বীকার্য, তারাশঙ্করের গ্রামীণ জীবনের অভিজ্ঞতা ছিল নিবিড় এবং সমৃদ্ধ। ঠিক শরৎচন্দ্রের মত। কিন্তু আমাদের আক্ষেপ, শরৎচন্দ্রের মত তাঁর সাহিত্যের সেভাবে উত্তরণ ঘটল না। শরৎচন্দ্রের 'পল্লী সমাজ', 'দেনা-পাওনা' কিংবা 'শেষপ্রশ্ন'র মত সৃষ্টি তিনি উত্তরকালের জন্য রেখে যেতে পারলেন না। অথচ সেই উপাদান তিনি পেয়েছিলেন, 'চৈতালি ঘূর্ণি', 'ধাত্রীদেবতা', 'গণদেবতা', 'কালিন্দী', 'মন্বন্তর' প্রভৃতি উপন্যাসে তার পরিচয় আছে। সেদিক থেকে তিনি একজন অসাধারণ মানুষ। তাঁর সৃষ্টি, তাঁর অভিজ্ঞতা, আমাদের ভবিষ্যতের পাথেয় হয়ে থাকবে।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com